চোর

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। সন্ধ্যে সাতটা না বাজতেই যেন নিশুতি রাতের জমাট আঁধার ঘনিয়ে এসেছে চারিদিকে। এ রাস্তাটায় লোকজনের চলাচল কম, অন্তত ভদ্রলোকের। ভারী শপিং-ব্যাগ ও বড় প্যাকেটগুলো ভাল করে সামলে নিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো মাধবী। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। বাজারটা যদি সকালে সেরে রাখতো, তাহ'লে আর এ দুর্ভোগ হ'ত না। কাল তার ছেলে রবীনের জন্মদিন। মাত্র পাঁচ বছর বয়স তার। কিন্তু বার্থ-ডে পার্টির সমস্ত কায়দা-কানুন মুখস্ত হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এতটুকু ত্রুটি হওয়ার জো নেই।

মাধবীর স্বামী অশোক দু'দিন আগে একটা কোর্ট অফ এনকোয়ারীতে শ্রীনগর গেছে। ফিরতে কমপক্ষে দু'হপ্তা লাগবে। মাধবীর ইচ্ছে ছিল জন্মদিনের উৎসবটা মুলতুবি রাখা। আজ সকালেও রবীনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল।

বলেছিল, "দ্যাখ, তোর জন্মদিনে পায়েস আর লুচি-মাংস রান্না করে বাড়িতে আমরা সবাই খাবো। বাঙালীদের জন্মদিন ওই রকমই হয়।"

কিন্তু কে শুনছে সে কথা ! ওর সব বন্ধুর জন্মদিনে পার্টি হয়। নতুন পোষাক পরে মোমবাতি দিয়ে সাজানো কেক কাটে, আর সবাই মিলে মোটা গলায় গান ধরে - হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ ----। রবীনের জন্মদিনও ঠিক তেমনি করেই করতে হ'বে। শেষ অবধি মাধবীকেই হার মানতে হ'ল।

নতুন ঝি সাবিত্রীর হেফাজতে রবীন ও রিতুকে রেখে চারটে আন্দাজ বেরিয়েছিল। ভেবেছিল একটা বড় কেক ও আরও কিছু খাবার-দাবার, ছোটখাটো ক'টা খেলনা ও রবীনের জন্যে একটা জামা কিনে সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরতে পারবে। কিন্তু বাজার করতে গিয়ে আর সময়ের

হুঁশ ছিল না। তার উপর আর এক বিপত্তি। ফেরার সময় একটাও অটোরিক্সা খালি পেল না আজ। ওদের বাড়ি থেকে বাজার খুব একটা দূর নয়। বোধহয় এক কিলোমিটারও হবে না। তবে রাস্তাটা মোটেই ভাল নয়।

বাজে মেয়েদের বস্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এত রাতে একা ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হ'বে মনে করে গায়ে কাঁটা দিলো মাধবীর। কিন্তু উপায় কি? বাচ্চা দু'টো বোধহয় এতক্ষণে খিদেয় কাঁদাকাটি আরম্ভ করেছে। ঝি-টা একেবারে নতুন। তার উপর সবকিছু ছেড়ে কতক্ষণ থাকা যায়?

ফাঁকা রাস্তায় চলতে চলতে মাধবীর গা শিরশির করে উঠলো। মাঝে মাঝে দু'এক জন লোক দেখা যায়। কিন্তু এ রাস্তায় মানুষ দেখলে যেন আরও ভয় করে। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? ফস করে হয়তো ছোরা বার করবে ! কাগজে রোজ যা সব খবর ছাপে ! আজ রাস্তার বাতিগুলোতেও যেন জোর নেই। মনে হয় দেশের মানুষগুলোর মত ওরাও বুঝি অনাহারে অর্ধাহারে ধুঁকছে। রাস্তার মোড়ে একটা জরাজীর্ণ বাড়ির জানলা দিয়ে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে, আর ভিতর থেকে মাতালের হৈ-হুল্লোড় ভেসে আসছে। ভয়ে মাধবীর গা গুলিয়ে উঠলো। ভারী ব্যাগটা যেন ওর হাতে কেটে কেটে বসছে, পা আর চলতে চায় না। মনে মনে দুর্গা নাম জপতে থাকে সে।

ছিঃ, কেন যে এমন বোকামি করতে গেল। বাজার থেকে তাদের প্রতিবেশী মিসেস কুলকারনিকে ফোন করলে, উইং কমাণ্ডার কুলকারনি নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে আসতেন। শুধু শুধু কারো অবলিগেশন্ নেওয়া পছন্দ করে না সে, কিন্তু দরকার পড়লে তারাও তো প্রতিবেশীদের জন্যে যথেষ্ট করে।

"মেমসাব ----।"

মাধবী চমকে উঠে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, "মাগো !"

রাস্তার পাশে গাছতলার জমাট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি নারীমূর্তি। শস্তা, উগ্র সাজপোষাকে তার নির্লজ্জ পেশার ছাপ।

"নির্মলা, তুম?" যেন নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে না সে।

উত্তরে মেয়েটি ম্লান হাসলো। পুরু পাউডার ও রুজ-লিপস্টিকের আড়ালে একটি ভীরু অসহায় কিশোরীর মুখ।

মাধবী ভাষা খুঁজে পায় না।

নির্মলার স্বরে উদ্বেগ, "মেমসাব, এ রাস্তায় কক্ষনো একা এসো না। খুব খতরনাক জায়গা। এখানে শুধু গুণ্ডা আর বদনাম-মেয়েদের আড্ডা।

ভাগ্যিস তোমায় দেখলাম। চলো, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ভারী ব্যাগটা ও প্যাকেটগুলো সযত্নে হাতে নিল নির্মলা। মাধবীর নিস্তব্ধতা যেন লক্ষ্যই করেনি সে। নিজের মনে অনর্গল কথা বলে চললো। মাধবীর চোখের সামনে তখন তিন বছর আগের একটি ছবি ভেসে উঠেছে।

তিন বছর আগের নির্মলা। রোগা, লম্বা, কালো একটি কিশোরী মেয়ে। আধ-পুরনো স্কার্ট ও ব্লাউজ পরনে। পুরোনো, কিন্তু ধবধবে ফর্সা। মিসেস সিং'এর আয়া ওকে মাধবীর কাছে এনেছিল। নির্মলা নাকি ওর দূর সম্পর্কের বোনের মেয়ে। বার্মা থেকে রিফিউজি হয়ে ক'দিন আগে এসেছে। ওখানে থাকতেই ওর বাবা মারা গেছে। এদেশেও কোন সহায়-সম্বল নেই ওদের। মা ও ছোট দুটি ভাই আছে সঙ্গে। মেমসাব যদি দয়া করে সারভেন্টস্ কোয়ার্টারে ওদের ঠাঁই দেন। মেয়েটাকে যা কাজ বলবেন করবে। মাধবী অবশ্য খুশিই হ'ল ওকে পেয়ে। গত ক'মাসে বার তিনেক ঝি বদল করে নাজেহাল অবস্থা তার। যদিও মনিব হিসেবে খুব একটা খুঁতখুঁতে নয় মাধবী। চোর-ছ্যাঁচোড় হবে না, বাচ্চা দু'টোকে একটু যত্ন নিয়ে দেখাশুনো করবে, আর দু'চারটে উপরি ছুটকো কাজ করবে, এটুকু পেলেই সন্তুষ্ট সে। বাচ্চা দু'টোকে একটু ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখবে, সেটাই সব থেকে বড় কথা। রবীনের সবে দু'বছর পুরেছে, রিতু ছ'মাসের। দু'টোতে মিলে এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া হ'তে দেবে না মাকে। পার্টি সিনেমা দূরে থাক, সময়মত স্নান-খাওয়াও দুষ্কর হয়েছে মাধবীর।

নির্মলা কাজে বহাল হ'ল। কয়েকদিনের মধ্যেই মাধবীর ওকে বেশ ভাল লেগে গেল। খুব একটা চটপটে কিংবা চালাক-চতুর নয়, কিন্তু আন্তরিকতা ও উৎসাহে সে খুঁতটুকু পুষিয়ে নেয়। এর আগে কখনো পরের বাড়ি চাকরী করেনি মেয়েটা, প্রভু ভৃত্যের মধ্যে মূল সম্বন্ধ যে স্বার্থের, সে বোধটুকু এখনও জাগেনি। রবীন ও রিতু অল্পদিনেই নির্মলার

ন্যাওটা হয়ে পড়লো।

নির্মলা তার মা ও ছোট দু'টি ভাইকে নিয়ে কোয়ার্টারে থাকতো। বাড়ির সঙ্গেই সারভেন্টস্ কোয়ার্টার। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে প্রায়ই মাধবী দেখতে পেতো রোগা কালো বিধবাটি তার দুই রুগ্ন শিশুকে পাশে নিয়ে বসে আছে। নির্মলার কাছে শুনেছিল একটির বয়স পাঁচ, অন্যটির তিন। দেখলে কিন্তু অনেক কম মনে হ'ত। কঙ্কালসার চেহারা। ছোট ছেলেটি ভাল করে হাঁটতে পারে না। খুব সম্ভব রিকেটে ভুগছে। ওর মা অন্য একটা বাড়িতে ঠিকে কাজ নিলো।

নির্মলা শুরুতে নিজের বরাদ্দের খাবারটা বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু গোড়া থেকেই এ বিষয়ে কড়া হয়েছে মাধবী। সে জানে বাড়ি নিয়ে গেলে ও ভাতের দু'মুঠোর বেশী পেটে পড়বে না মেয়েটার। বরং ভাত-রুটি বাসি থাকলে এক-আধদিন বাড়ি যাওয়ার সময় দিতো।

বলতো, "তোর মাকে দিস্।"

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো কালো মেয়েটার মুখখানা। দীর্ঘশ্বাস চেপে মনে মনে ভাবতো মাধবী, আহা, মেয়েটার মনটা ভারী ভাল।

এক বছর কেটে গেল। স্কার্ট ছেড়ে এখন শাড়ি পরে নির্মলা - মাধবীরই পুরনো শাড়ি। এক এক করে সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়েছে সে। রিতুকে আর সর্বক্ষণ কোলে রাখতে হয় না। নির্মলার পায়ে পায়ে ঘোরে রিতু, আর নির্মলা একটার পর একটা কাজ করে যায়। এই একটা বছর মাধবী যে কি আরামে কাটিয়েছে। অবশ্য সেও অকৃতজ্ঞ নয়। নিজে থেকে নির্মলার মাইনে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। পুজোয় দিয়েছে ভালো দামের ছাপা শাড়ি। এ ছাড়া বাড়িতে ভাল-মন্দ যখন যা রান্না হয়েছে, অকৃপণ হাতে দিয়েছে তাকে।

কিন্তু সুখ বুঝি কারো কপালে বেশিদিন সয় না। নির্মলার মার কাজটা গেল। দোষ তারই। তার ছেলে দু'টো ইদানীং বড় বেশী ভুগছিল। মাকে ছাড়তে চাইতো না মোটে। তাই ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে লাগলো দু'বেলা। ও যতক্ষণ কাজ করতো, বাচ্চা দু'টো দরজায়

দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতো। একদিন নাকি ওখানেই পায়খানা, বমি করে। ঝিয়ের কাজ ভাল বলে এতদিন চুপ করে ছিলেন মিসেস সাইগল, সেদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। সেই মুহূর্তে বরখাস্ত হ'ল নির্মলার মা। এরপর অনেক জায়গায় কাজের চেষ্টা করলো সে। কিন্তু ঝিয়ের সঙ্গে এক জোড়া রুগ্ন বাচ্চা এসে বারান্দা লন ময়লা করবে, সে ব্যবস্থায় রাজী হ'বে কে?

নির্মলা শুকনো মুখ করে বসে থাকে। রবীন-রিতুকে গল্প বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মাধবীর মায়া লাগে। মাঝে মাঝে এটা-ওটা পাঠায় ওর হাতে। রিতুর বিকাডেক্স'এর শিশিতে অর্ধেকটা বাকী ছিল। নির্মলাকে দিল ভাইয়ের জন্যে সেটা। এর বেশি আর কি করতে পারে সে? মাধবী জানে দীর্ঘদিনের দারিদ্রে অপুষ্টির শেষ সীমায় পৌঁছেছে বাচ্চাগুলো। বাঁচতে হ'লে ওদের সব থেকে দরকার এখন খাবার। শুধু পেট ভরে খাওয়া নয়, ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবার। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও নিয়মিত জোটে না যাদের, তাদের পক্ষে সে সবের স্বপ্নও বাতুলতা। দু'বেলা নির্মলার থালায় বেশি করে ডাল ঢালতে ঢালতে ভাবে আহা, এ মেয়েটা অন্তত বাঁচুক।

এরপর এলো সেই দিন। সে দিনটার কথা পরিষ্কার মনে পড়ে মাধবীর। সে দিন দোল পূর্ণিমা। অফিস ছুটি। অফিসার্স মেসে হোলি খেলার জবরদস্ত প্রোগ্রাম হয়েছে। দুপুরে বিরাট ভোজ। রবীন ও রিতুকে নির্মলার কাছে রেখে সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওরা। মেসে বাচ্চাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ওদের নিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল না মাধবীর। তাছাড়া, শীতকাল শেষ হ'লেও দিল্লীতে তখনও শীতের আমেজ যায়নি। মাথায় গায়ে একগাদা রঙ, আবির মেখে বাড়ি ফিরবে। অবেলায় স্নান করে ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে যেতে পারে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে ছেলেমেয়েকে বাড়িতে রেখে গেল। তাদের ও নির্মলার জন্যে খাবার রেখে এসেছে। ভাতটা নির্মলা নিজেই ফুটিয়ে নেবে।

ঠিক ছিল বিকেলে ফিরবে। কিন্তু দুপুরের দিকে মাথা ধরলো সুব্রতর। রোদ্দুরের মধ্যে মাতামাতিটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছিল। মাধবীরও আর ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল কতক্ষণে বাড়ি গিয়ে ভাল করে স্নান করবে। বাড়ি যাওয়ার নাম করতেই সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠলো - না খেয়ে

কিছুতেই যেতে পারবে না। ভোজ শেষ হ'তেই বেরিয়ে পড়লো দু'জনে।

বাড়ির কাছে এসে দেখে দরজা খোলা। ওরা অবাক হ'ল। নির্মলাকে পই পই করে বলে দিয়েছে মাধবী যে ওরা বাড়ি না থাকলে যেন দরজা সব সময় বন্ধ রাখে। এর আগে এর অন্যথা কোনদিন করে নি নির্মলা। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে আর এক প্রস্থ অবাক হ'ল। নির্মলার মা রান্নাঘর থেকে ছোট্ট একটা পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে আসছে। ওদের দেখে সে চমকে উঠলো। হাত থেকে পুঁটলিটা মাটিতে পড়ে একরাশ চাল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তিন-চারটে আলু গড়াগড়ি খেতে লাগলো। মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল মাধবীর কাছে। যদি বা কিছু সংশয় থাকতো, দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা নির্মলার ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে মুখ দেখে তারও অবকাশ রইলো না আর।

"চোর, তুই চোর? এতদিন ধরে দুধ-কলা খাইয়ে তোদের এই জন্যে পুষেছি? দু'মুখো সাপেরও অধম তোরা! হারামজাদী দূর হ, দূর হ আমার সামনে থেকে তুই।"

মাধবীর মাথায় যেন খুন চেপে গেছে। নির্মলার মা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে কাঁদছিল। নির্মলার চোখে জল নেই, মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ তার। মাধবী ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে দরজার কাছে আনলো। তারপর ধাক্কা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

"এক ঘন্টার মধ্যে আমার কোয়ার্টার খালি না করলে পুলিশে দেবো তোদের।"

রাগে-দুঃখে হাঁপাতে লাগলো মাধবী। চিৎকার শুনে রবীনের ঘুম ভেঙে গেছে। ও এঘর ওঘর নির্মলাকে খুঁজতে লাগলো।

মাধবী দুম করে কিল বসালো ছেলের পিঠে, "খবরদার, নাম করবি না ওর।"

শোবার ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো মাধবী। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে তার। ঝি-চাকর সুযোগ পেলেই চুরি করে, এ কথা সে বরাবর শুনে এসেছে। কিন্তু তাই বলে নির্মলা? ওর যত রাগ সেই জন্যে। ওকে ঝিয়ের মত কোনদিন মনে করেনি সে। এত বিশ্বাস করেছে, স্নেহ করেছে। খুব তার শোধ নিল মেয়েটা।

মাধবী ক্যাম্পের গার্ডরুমে খবর দিতে চেয়েছিল। নির্মলা ও তার মায়ের নাম ব্ল্যাক-লিস্টে উঠবে তাহ'লে। ক্যাম্পে ঢোকা নিষেধ হয়ে যাবে। কিন্তু সুব্রত কিছুতেই রাজী হ'ল না। তার মতে, ইচ্ছে করলে ওরা এর আগে অনেক কিছু চুরি করতে পারতো। ওর ভরসায় বাড়ি-ঘর ছেড়ে কতদিন বাইরে থেকেছে ওরা। পলকা কাঠের ওয়ার্ডরোবের ড্রয়ারে টাকা-গয়না সব কিছু রাখে মাধবী। ইচ্ছে করলে সমস্ত ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। তার বদলে আধসের চাল আর পোয়াখানেক আলু চুরি করেছে শুধু। সে অপরাধে ওকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছে মাধবী, সেটাই যথেষ্ট দণ্ড। ক্যাম্প থেকে তাড়ানোর দরকার নেই। ফলে গার্ডরুমে খবর দিল না ওরা। কিন্তু তবুও ক্যাম্পের বাস ঘুচলো ওদের। স্কোয়াড্রন লিডার ব্যানার্জীর বাড়ি চুড়ি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, এ সংবাদ একবেলার মধ্যে অন্যান্য অফিসার-গিন্নীদের কানে তো উঠলোই, তাদের ঝি, চাকর, গোয়ালা, জমাদার কেউই বাদ রইলো না।

এরপর মাধবী আর ওদের দেখেনি। নির্জীব বাচ্চা দু'টোকে কোলে নিয়ে, নিজেদের সমস্ত পার্থিব সম্বল পুঁটলিতে বেঁধে ওরা যে কখন চুপিচুপি পাড়া ছেড়ে চলে গেল সে খবর জানে না মাধবী। আজ নির্মলার মুখে শুনলো। ছোট ভাইটা নাকি বেশিদিন বাঁচেনি। ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই মারা গেছে। ওরা অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কাজ জোটাতে পারেনি। ওর মা'কেও রোগে ধরেছিল, কাজ করার ক্ষমতাও আর ছিল না তার। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার মোড়ে চুপ করে বসে থাকতো, যদি কেউ দয়া করে দু'টো পয়সা দেয় সেই আশায়।

পনেরো বছরের নির্মলা পাগলের মত দরজায় দরজায় মাথা কুটতো, "ওগো, দয়া করে একটা চাকরী দাও। যে কাজ বলবে করবো আমি। আমার মা-ভাই না খেয়ে মরে যাবে। দয়া করো।"

শেষ পর্যন্ত কাজ জুটলো নির্মলার। মেয়েটা মুখে সব কথা না বললেও, এর পরের ঘটনাগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মাধবী। অবশ্য নির্মলা তার মাকে বাঁচাতে পারলো না, তার রোগ তখন চিকিৎসার বাইরে। তবে অন্য ভাইটা আছে, স্কুলে পড়ে।

ক্যাম্পের গেটের কাছে এসে থামলো ওরা।

"মেমসাব, এবার আমি যাই।"

কি করবে, কি বলবে ভেবে পায় না মাধবী। পার্স খুলে বাজারের উদ্বৃত্ত টাকা থেকে খান কয়েক নোট গুঁজে দেবে ওর হাতে? নাকি সজল চোখে নির্মলার একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে দু'বছর আগের সেই ঘটনাটার জন্যে মুক অনুতাপ জানাবে?

কিন্তু দু'টোর কোনটাই পারলো না সে। মাথা নীচু করে চোরের মত পালিয়ে এলো শুধু।